প্রমথ চৌধুরীর গল্প

সমরেশ মজুমদার

বাংলা সাহিত্যে প্রমথ চৌধুরী (১৮৬৮-১৯৪৬) একান্তভাবে একক পথযাত্রী, এই নিঃসঙ্গ গমন তাঁর স্বকীয়তা থেকে উদ্ভূত। তিনি বঙ্গভাষার যে যে ভূমি কর্ষণ করেছেন, তাতে পূর্ববর্তীরা আছেন, তাঁদের ঐতিহ্যকে অঙ্গীকার করেও সাহিত্যের বিচিত্র ধরনের এক স্বতন্ত্র ধারার প্রবর্তন করেছেন। তাঁর জীবনচর্যার মধ্যেই এ-বৈশিষ্ট্য জড়িত, শহুরে ও গ্রামীণ যে পটভূমিতেই তাঁর গল্পকে তিনি উপস্থাপিত করুন না কেন, তার গঠন-বিন্যাস, বিষয়কে উপস্থাপনের কাছাকাছি অন্য কাউকে দেখা যায় না। বাংলা গল্প-সাহিত্যের যিনি প্রকৃত স্রষ্টা, সেই রবীন্দ্রনাথ তাঁর সবচেয়ে নিকটবর্ত্তী, সে শুধু সান্নিধ্যের নৈকট্যে, মনন ও তাকে পরিচালনায় বীরবলীয় প্রমথনাথ ভিন্ন অন্য কারো প্রবেশ-নিষেধ। তাঁর গল্পপাঠে কবি সপ্রশংস, কিন্তু রবীন্দ্র-ছায়া তাঁর গল্পে কোথাও নেই। তাঁর অনূদিত গল্পরচনা রবীন্দ্রনাথের মনঃপুত হয় নি, 'আত্মকথা'য় তিনি বলেছেন, 'এরপর সুরেশ সমাজপতি কর্তৃক সম্পাদিত 'সাহিত্য' পত্রিকায় 'Prosper Mérimée'-র 'Etruscan Vase' নামক একটি গল্প তর্জমা ক'রে 'ফুলদানি' নাম দিয়ে প্রকাশ করি। সেটি প'ড়ে রবীন্দ্রনাথ 'সাধনা'য় আমাকে আক্রমণ করেন। দু'টি কারণে, প্রথমত, 'ফুলদানি'র মত গল্প বঙ্গসাহিত্যের অন্তর্ভুক্ত করা অনুচিত বলে, দ্বিতীয়ত, পাকা ফরাসী লেখকের লেখা কাঁচা বাংলা লেখকের অনুবাদ শ্রীভ্রষ্ট করা হ'য়েছে বলে। আমি শেষোক্ত আপত্তি গ্রাহ্য করি। কিন্তু এ জাতীয় গল্প যে বঙ্গসাহিত্যে চলতে পারে না, সে কথা আমি মানি নি। ..... সাহিত্যিক শুচিবাই প্রথম থেকেই আমার ধাতে ছিল না।' আবার রবীন্দ্রনাথই লিখেছেন, ক. 'প্রমথ চৌধুরীর গল্পমাত্রেই পালিশ করা, ঝকঝকে, তীক্ষ্ন; উজ্জ্বলতার বাতায়নে মগজের তিনতলা মহলে, মধ্যাহ্নের আলো সেখানে অনাবৃত।' খ. 'তুমি একবার কোমর বেঁধে গল্পে লাগলে আমি ত খুশি হই। আমার বিশ্বাস তুমি পারবে — অবশ্য; সম্পূর্ণ তোমার নিজের খাঁচার একটি জিনিষ হবে — অর্থাৎ ইস্পাতে গড়া মূর্তি হবে, ঝকঝক করবে অথচ কঠিন হবে — কড়া আগুনে গালাই করা ঢালাই করা জিনিষ।' এখানেও প্রমথনাথের স্বকীয়তার প্রশ্ন উঠে আসছে, অপরের গল্প ভাষান্তরে

প্রকৃত বীরবলকে পাওয়ার চেয়ে স্বরচিত গল্পেই তিনি প্রকাশমান। এর ফলে বাংলা গল্পে তাঁর নিজের বৈচিত্র্যসাধক গল্প যেমন এসেছে, বাংলা গল্পভাণ্ডার তেমনি সমৃদ্ধ হয়েছে। তাঁর কর্ষিত চিত্তে কলকাতার বুদ্ধিদীপ্ত মনীষার ছোঁয়ার সঙ্গে বিলিতি উদার প্রাঙ্গনে জড়িত 'মন্ত্রশক্তি' বা 'ঝাঁপান কথা', 'ভূতের গল্প' এর মধ্যে গাঁজার কল্কের উর্ধ্বগামিতার চিত্রও অক্লেশে স্থান পেয়েছে। একবার বুদ্ধদেব বসুর নিকটবর্তী হওয়া যেতেই পারে, 'Though provokingly modern in his essays, his stories are of old-world romance, of dangerous living and abounding animal spirits. Two cities, Calcutta and London figure in his stories, the latter more vividly than the former, but the world of his fiction is really that of Bengal's landed gentry, decadent, yet retaining some traces of court culture' (An Acre of Green Grass, November, 1982, edition, pg 35) ।

প্রমথ চৌধুরীর মতো রচনাকারেরা সাহিত্যে আসেন বলেই কোনো ভাষা-সাহিত্যে একঘেয়েমির আবর্ত থেকে মুক্ত হয়। বৈচিত্র্য সন্ধানীও হয়ে থাকে। যে প্রমথনাথ জানান, 'আমি জন্মেছিলুম পদ্মাপারের বাঙ্গাল কিন্তু আমার মুখে ভাষা দিয়েছে কৃষ্ণনগর' — এই কৃষ্ণনাগরিক প্রকৃতপ্রস্তাবে বিশ্বনাগরিকও বটেন, একই সঙ্গে বৈদগ্ধ্য ও সাধারণ্যের তুচ্ছাতিতুচ্ছ জীবনচর্যার বিবরণ দানের যোগ্যতা বস্তুতই বিস্ময়কর। অন্বেষণে আরো চোখে পড়ে বাংলা বৈঠকীগল্পের তিনি উত্তরাধিকার বহন করেছেন। এই বৈঠকী মেজাজের মধ্যেই 'চার-ইয়ারী কথা' লিখিত হয়েও লন্ডন ও তার পার্শ্ববর্তী অঞ্চল বেষ্টন করেছে তাঁর গল্পরাজি, তথাপি বাংলা গল্পের বিচিত্র মেলায় তিনি খুব পঠিত, এমনতরো কথা বলা যায় না। সাধারণ পাঠকের মনোজয়িতার লক্ষণ তার গল্পে নেই, এমনকী বৈঠকীগল্পেও এক সীমিত সংখ্যক পাঠকের পরিতৃপ্ততার আসর সেখানে, গল্পের সর্বতোমুখিতা না থাকলে জনপ্রিয়তা অর্জন করা সম্ভব নয়। আদৌ প্রমথ চৌধুরী তা চেয়েছিলেন, এই পাঠকের মনোযোগ আকর্ষণ? এই স্বাতন্ত্র্য তাঁর অভীপ্সিত ইচ্ছাকৃত বললেও খুব অনৃতভাষণ হবে না। আমরাও আচার্য রথীন্দ্রনাথ রায়ের সঙ্গে সহমত পোষণ করতে পারি, 'বাক্-চাতুর্য' শ্লেষের সুচতুর শরক্ষেপ ও তীক্ষ্মচূড়-এপিগ্রামের অজস্র প্রয়োগ লেখকের মূল উদ্দেশ্যকে মাঝে মাঝে পথভ্রান্ত ক'রেছে (বাংলা সাহিত্যে প্রমথ চৌধুরী, প্রথম সংস্করণ, পৃ ১১২)। বৈচিত্র্যসাধনার মধ্যে বৈপরীত্য স্থাপনও পাঠকের সঙ্গে নিগূঢ় সংযোগ ক্ষুণ্ণ করেছে, সত্যের খাতিরে এ-কথা স্বীকার করে নিতে হয়। 'চার-ইয়ারী কথা'র শেষতম ইয়ারের অর্থাৎ 'আমার কথা'য় তৃপ্ত হয়ে কবি তাকেই 'human' আখ্যা দিয়েছেন। জীবন-মৃত্যুর ব্যবধান ঘুচে যাওয়া, কাহিনী আকর্ষক হয়ে উঠেছে, অথচ মৃত মানুষ টেলিফোন করতে পারেন কিনা এ কূট তাত্ত্বিকতা পাঠকের মনে স্থান পায় না, যদিচ প্রমথ চৌধুরীর গল্পমালা জুড়ে তর্ক ও বাক্য-চালাচালি মূল বিষয়ে অভিনিবেশে বিঘ্ন সৃষ্টি করেছে, মানবিক আবেদন সবসময়েই সগৃহনীয়, এসব কথা

স্মরণে রাখেন নি প্রমথ চৌধুরী, কারো দৃষ্টিতে লেখেননি, এ নিজস্বত্ত নন্দিত, কিন্তু তিনি গল্পের লেখক হতে পারেন, এর রসভোক্তা তো পাঠকই, তাকে গণনার মধ্যে না ধরলে রচনার উদ্দেশ্যই অর্থহীন হয়ে দাঁড়ায়। তিনি কী করে বিস্মৃত হবেন 'সবুজপত্রে'র তাগিদেই তাঁকে মৌলিক গল্প-রচনার আসরে অবতীর্ণ হতে হয়েছিল, রবীন্দ্রনাথ স্বয়ং জানিয়েছেন, 'প্রমথ চৌধুরী'র গল্পসংগ্রহের ভূমিকায়, 'আমি যখন সাময়িকপত্র চালনায় ক্লান্ত এবং বীতরাগ, তখন প্রমথর আহ্বানমাত্রে 'সবুজপত্র' বাহকতায় আমি তাঁর পার্শ্বে এসে দাঁড়িয়েছিলুম', প্রথম পর্যায়ে তাঁর আনুকূল্যে ভরে ছিল পত্রিকাটি, সেখানেই বিচিত্রবর্ণের গল্প উপহৃত হয়েছে তাঁর লেখনিজাত হয়ে। বাংলা সাহিত্যের সনাতনীপ্রথায় গল্পরচনার যে ধরন তৈরি ছিলো, তাকে একেবারেই নিজস্ব পদ্ধতি-প্রকরণ, রসসিদ্ধ ও শাণিত করে পূর্বে যাঁরা এ জাতের গল্পে পারদর্শী ছিলেন, তাঁদের গল্প সৃজনের প্রবণতাকে অনায়াসেই এড়িয়ে নিজের ঘরানা তৈরি করতে সক্ষম হয়েছিলেন। বাংলা গল্পের ইতিহাসে শুধু কেন ছোটোগল্পের সূচনাই তো হয়েছিল সাময়িকপত্রের ক্ষুধা মেটানোর জন্যে, বঙ্কিমচন্দ্রও পূর্ণচন্দ্রকে দিয়ে প্রচেষ্টা করেছিলেন। যদিচ এর জন্য কোনো এক রবীন্দ্রনাথের প্রয়োজন ছিল, 'বঙ্গ দর্শন' ১২৭৯-৮২ পর্যন্ত বঙ্কিমচন্দ্রের, ১২৮৪-৮৯ সঞ্জীবচন্দ্রের, ১৩০৮-১৩১৩ বঙ্গাব্দ পর্যন্ত রবীন্দ্রনাথের দ্বারা সম্পাদিত হয়েছিল। 'সাধনা' (১৮৭২-৯৫ খ্রিস্টাব্দ) 'সবুজপত্র' (প্রথম পর্যায় ১৩২১-২৯) দ্বিতীয় পর্যায় (১৩৩২-৩৪ বঙ্গাব্দ) বাংলা সাময়িকপত্রের বিশালত্বের সম্ভারে শেষোক্ত দুই পত্রিকা না থাকলে বাংলা ছোটোগল্পে দীন হয়ে থাকত। এখানে প্রমথ চৌধুরীর দায়বদ্ধতার কথা স্বীকার্য। সেই সঙ্গে স্মর্তব্য চলিত বাংলায় সাহিত্য রচনার দ্বার উন্মুক্তকরণে বাঙালি সমাজের কৃতজ্ঞতার প্রসঙ্গটি।

বাংলা-সাহিত্যের ছোটোগল্পের মিছিলে প্রমথ চৌধুরীর দানের প্রসঙ্গটিও স্মরণে রেখে বলা যায় যদিচ তিনি মুখ্যত গল্পকার নন, তবু সামগ্রিক বিচারে বাংলা গল্পধারায় তাঁর একটি বৈশিষ্ট্যপূর্ণ স্থান আছে। পুনরপি বলা বিধেয় বাংলা গল্পের রীত্যানুসারে একটি ধারার সঙ্গে তিনি সম্পৃক্ত, তা হল বৈঠকীগল্প। উৎকৃষ্ট মননের অধিকারীদের লেখনিতে বৈঠকীগল্প ভালো খেলে, তাঁর উদাহরণ ত্রৈলোক্যনাথ থেকে রাজশেখর বসু পর্যন্ত। 'ত্রৈলোক্যনাথের মধ্যে আমরা দুটি যুগকে দেখতে পাই। একটি ঐতিহ্যের — যেখানে লেখক বিশুদ্ধ গল্পবিলাসী, — সেখানে রুপো বাঁধানো ধূমায়িত হুঁকোটি হাতে তিনি জমাট গল্প বলতে বলতে বসেছেন, 'এ সেই বটতলার 'দা-ঠাকুরের গল্প' ধারার অনুবর্ত্তন। ..... ত্রৈলোক্যনাথের গল্পের দ্বিতীয় অধ্যায় বা দ্বিতীয় যুগটি স্বজাতি ও সমাজ সমালোচনায় বিশিষ্ট' (বাংলা গল্প বিচিত্রা, নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়, দ্বিতীয় সংস্করণ, পৃ ১০-১১)। রূপক অর্থে ভূতের ব্যবহার অনবদ্য হয়ে উঠেছে সেখানে, দেশজ কুসংস্কার ও ইংরেজ শাসনকে ব্যঙ্গ বিদ্ধ করবার

হাতিয়ার তুলে নিয়েছিলেন লেখক নিছক ভৌতিক কাহিনী-সৃজনের তাগিদে নয়। 'কঙ্কাবতী' থেকে 'ডমরুধর' সরস মজলিশী আসর থেকে তীক্ষ্ম তীব্র হয়ে উঠেছিল বক্তারা। প্রমথ চৌধুরী বেছে নিয়েছিলেন নীললোহিত ও ঘোষালকে 'নীল-লোহিতের সৌরাষ্ট্রলীলা', 'নীল-লোহিতের স্বয়ম্বর', 'নীল-লোহিতের আদি প্রেম' থেকে 'ফরমায়েসী গল্প', 'বীণাবাঈ', 'ঘোষালের হেঁয়ালি' বৈঠকী গল্পের নানাবিধ সৌষ্ঠব নিয়ে হাজির হয়েছে, 'নীল-লোহিত' নামীয় গল্পকেই এর সূচনা বলা যায়। এখানে নীল-লোহিতের চরিত্রটি পাঠকের কাছে স্পষ্ট ও প্রত্যক্ষ হয়ে ওঠে। লেখক শুরুই করেছেন গল্পটি এইভাবে : 'আমাকে যখন কেউ গল্প লিখতে অনুরোধ করে, তখন আমি মনে মনে এই বলে দুঃখ করি যে, ভগবান কেন আমাকে নীল-লোহিতের প্রতিভা দেননি', 'গল্প বলতে নীল-লোহিতে'র তুল্য গুণী আমি অদ্যাবধি আর দ্বিতীয় ব্যক্তি দেখিনি, 'তারপর কথা তিনি শুধু মুখে বলতেন না, গল্প তাঁর হাত, পা, বুক, গলা সব একত্র হয়ে একসঙ্গে বলত। 'এক কথায় তিনি শুধু গল্প বলতেন না, সেই সঙ্গে সেই গল্পের অভিনয়ও করতেন।' নীল-লোহিতের গল্পে স্থানের মাহাত্ম্য একটি বিশেষ ক্ষেত্রে নিবদ্ধ থাকত না সুরাট থেকে শুরু করে তার স্থান-কাল বিচিত্রধর্মী, যেমন গল্পগুলি নানান বর্ণের ও বিচিত্রতার মিছিলে উদ্ভাসিত।

'নীল-লোহিতের সৌরাষ্ট্রলীলা' নিয়েই নীল-লোহিত তর্পণ করা যেতে পারে, তীব্র এপিগ্রাম ও প্যারাডক্সে মোড়া রচনার স্রষ্টা তীক্ষ্ম বিদ্রূপ হানতে জানতেন সামাজিক দুর্নীতি ও মনুষ্য জীবনকে দুর্বিষহ করে তোলার আয়োজনকে, সময়ের পক্ষে উপযুক্ত কার্যাবলি সেক্ষেত্রে হাতিয়ারের কাজ করতে সহায়ক হয়ে থাকে। এ সুযোগের সদ্ব্যবহারে অনীহ ছিলেন না প্রমথ চৌধুরী। তিনি জন্মেছিলেন পরাধীন ভারতবর্ষে, একটি বছরের জন্যে দেশের স্বাধীনতা দেখে যেতে পারেন নি, এই সময়সীমায় স্বাধীনতা-যুদ্ধে প্রণিপাতের মানুষ যেমন দেখেছেন — মন্ত্রের সাধন কিংবা শরীর পাতনের অঙ্গীকারবদ্ধ ব্যক্তি তাঁর সম্মুখে ছিলো। তেমনি রাজনীতির অন্তঃকলহ তাঁর দৃষ্টি এড়িয়ে যায় নি। সরাসরি এ-সবের বিবরণ দেওয়া অপেক্ষা সাহিত্য রচনার মধ্যে তাকে প্রকাশ করা বেশি উপযুক্ত আয়ুধ বিবেচনা করেছিলেন, স্বভাবসুলভ রসবোধকে কাজে লাগিয়ে বক্ষ্যমান গল্পটি রচনা করেছিলেন। বি. এন. আর. দিয়ে একটি প্যাসেঞ্জারে গমন থেকে কংগ্রেস অধিবেশনে পরস্পরের হানাহানি, পাদুকা নিক্ষেপ, সেখানে প্রবেশের অনধিকার, 'Extremist camp', ছদ্মবেশে অধিবেশনে প্রবেশ ইত্যাকার জটের মধ্যে রসচ্ছলেই সুরাটীয় ক্রিয়াকলাপ বর্ণিত হয়েছে, এর মধ্যে ঝাড়লণ্ঠন, সুমধুর সঙ্গীত, সালাঙ্কারা রমণীর সূত্রে মূল মঞ্চে প্রবেশ, নূরজাহানের ফটো প্রসঙ্গ সবই নীল-লোহিতসুলভ সুষমায় মণ্ডিত। 'নীল-লোহিতের স্বয়ম্বর'-এ তদ্রুপ রসসিক্ত রচনা, প্রাচীন স্বয়ম্বরপ্রথা, কালিদাসের রচনার বর্ণনা, সহায়কের ভূমিকা নিয়েছিল, একদা ছাত্রী মালাশ্রীর জন্যে আয়োজিত

স্বয়ম্বরসভা পিতার ক্ষাত্রধর্মে দীক্ষার ফসলস্বরূপ এই আয়োজন, বস্তুত রসবোধের ছড়াছড়ি গল্প জুড়ে, এর একটু উদাহরণ দেওয়া সঙ্গত, ক. 'দরওয়ানের সঙ্গে ওস্তাদের তফাৎ জান? দুজনেই ডাল রুটি ও গাঁজা খায়, দুজনেই মুগুর ও সুর ভাঁজে'। খ. 'ভোজপুরীদের সঙ্গে লাঠিয়ালদের তফাৎ এই যে, লেঠেলরা খেতে না পেলে ডাকাত হয়, আর ভোজপুরিয়া পাহারাওয়ালা'। গ. 'ঘোর মূর্খের দলরা হচ্ছে সব কর্মবীর, ইংরাজীতে যাকে বলে Sportsman ... তারপরে জ্ঞানবীরদের আসন। এরা সকলেই ডক্টর — শুধু কারও D-র পেছনে আছে L, কারও L.T., কারও S.C.'। গ. মালাশ্রীর সঙ্গে আছে একটি মহিলা, যেমন বেঁটে তেমনি রোগা, যেমন কালো, তেমনি ফ্যাকাসে — এক কথায় শ্রীমতি মূর্তিমতী dyspepsia'। ঘ. নিজের পত্রিকাকেও ('সবুজপত্র') রেয়াত করেননি লেখক, 'ইনি হচ্ছেন বীর নৃসিংহ ভক্ত, প্রসিদ্ধ 'তেজপত্রের' সম্পাদক। প্রথমে ইনি ছিলেন গত সবুজপত্রের সহকারী সম্পাদক, সে কাগজে বীরবলের ব্যঙ্গের ভয়ে ইনি মন খুলে হাত ঝেড়ে লিখতে পারেননি।' তৃতীয় রচনাটি 'নীল-লোহিতের আদিপ্রেম', এখানে প্রেমের বিচিত্র ব্যাখ্যান আছে, নীল লোহিত তাঁর পাঁচ বছর বয়সেই প্রেমে পড়েন, পরে যতবার পড়েছেন সেগুলি প্রথম প্রেমের Reprint মাত্র, নীললোহিত এই বলে তাঁর গল্পের সূত্রপাত করলেন যে এ গল্প তোমাদের বলতুম না, কারণ প্রেম যে কি বস্তু তা যারা মর্মে মর্মে অনুভব করেছে, তারা পাঁচজনের কাছে প্রেমের ব্যাখ্যান করে না, করে তারাই যারা প্রেমের শুধু নাম শুনেছে। কিন্তু রূপ দেখেনি — যথা আধ্যাত্মিক কবিরা আর দেহতাত্ত্বিক বৈজ্ঞানিকেরা। পরে নীল-লোহিত জানান : অবশ্য এ জাতীয় মনোভাব (প্রেমে পড়া)ত আর বই পড়ে শিখতে হয় না, ঠেকেই শিখতে হয়। প্রেমে পড়া আমার সহজ প্রবৃত্তি। তাঁর প্রথম প্রেমিকার গায়ে স্কুলের বেড়া দিয়ে বন্দুকের গুলি আসছে দেখে 'নীল-লোহিত আর তিলমাত্র দ্বিধা না করে, বাঁ হাত দিয়ে শ্লেটখানি মেয়েটির মুখের সুমুখে ধরলেন আর গুলিটি শ্লেট ভেদ করে বেরবামাত্র ডান হাত দিয়ে সেটি চেপে ধরলেন। তখন গুলির তেজ কমে এসেছে, তাই সেটি নীল-লোহিতের মুঠোর মধ্যে রয়ে গেল।' রূপদর্শী তথা গৌরকিশোর ঘোষ পরে যাকে 'গুল্ফ' আখ্যা দিয়েছিলেন এর সঙ্গে তার মিল খুব কাছাকাছি।

নীল-লোহিতের কাছ থেকে এবার ঘোষালের মুখোমুখি হওয়া যেতে পারে। মজলিসি গল্পে ঘোষালের আস্তানা হলো মকদমপুরের জমিদার রায় মশায়ের বৈঠকখানা, বৈঠকীগল্প ও বৈঠকখানা শব্দদ্বয়ের অঙ্গাঙ্গী অবস্থানের কথা কাউকে বুঝিয়ে বলতেই হয় না। 'ফরমায়েসি গল্প' বস্তুতই একটি উল্লেখযোগ্যতা নিয়ে উপস্থাপিত। শ্রাবণমাসের মেঘলা প্রহরে বর্ষার গল্প খুবই জুৎসই। এ প্রসঙ্গে বলে নেওয়া ভালো তর্ক-তার্কিকরা প্রমথ চৌধুরীর গল্পমালাকে সর্বত্রই আবৃত করে রাখে। বিশেষত বৈঠকখানায় তর্ক-বিষয়ক ঘটনা খুবই তাৎপর্যপূর্ণ। ঘোষাল ও পণ্ডিত

মশায় এ নিয়ে সব সময়ে চাপান উতোরে ব্যস্ত থাকেন। আর আছে নীলমণি গোস্বামী। ঘোষাল তার পেছন থেকে গোস্বামী কেটে দিয়ে সুমুখে 'উজ্জ্বল' জুড়ে দিয়েছিল, তার বর্ণ ছিল ঘোর কৃষ্ণ, আর তিনি 'উজ্জ্বল নীলমণি'র দোহাই দিতেন। কাব্যরস, পদাবলী ও সঙ্গীতবিষয়ক আলোচনা, সঙ্গীতের নানান রীতি এমনিতেই প্রমথ চৌধুরীর গল্পে উপস্থিত থেকেছে প্রায়শ। আর এই গল্পে উপমার অভিনবত্ব চোখে পড়ে খুব, বস্তুত সামঞ্জস্যবিরহিত গল্পের সঙ্গে তা যথেষ্ট সঙ্গতিসূচক। যেমন, 'শ্রাবণ মাস, অমাবস্যার রাত্তির, তার উপর তেমনি দুর্ভোগ। চারদিক একেবারে অন্ধকারে ঠাসা। আকাশে যেন দেবতারা আবলুস কাঠের কপাট ভেজিয়ে দিয়েছে; আর তার ভিতর দিয়ে যা গলে পড়ছে তা জল নয় — একদম আলকাতরা। আর তার এক এক ফোঁটা কি মোটা। যেন তামাকের গুল —' । তর্ক-গল্প-মজলিস- বর্ষা সব মিলিয়ে লৌকিক-অলৌকিকের এক বিচিত্র আসর। গল্পের গোরু ঘোষালের মুরব্বিয়ানায় গাছ ছাড়িয়েও উঠে খেতে চায়, রায়মশায় প্রশ্ন করে বিব্রতও করেন। যেমন মাথার ওপর চন্দ্র ধমকানোর প্রসঙ্গে 'সেদিন স্বর্গে হচ্ছিল দেওয়ালি', রায় মশায় শ্রাবণমাসে দেওয়ালি কেন প্রশ্নের উত্তরে ঘোষাল জানায় পাঁজি সে মানে, কিন্তু দেবতারা মানেন না স্বর্গে ত সমস্তক্ষণই শুভক্ষণ। বাক্যে-প্রশ্নে ঘোষালকে বিব্রত করা মুশকিল তার মুখে উপযুক্ত সময়ে উপযুক্ত বাক্য যথাসময়েই এসে যায়, কী করে তাকে নিরস্ত করবেন রায় মশায়? অসঙ্গত বিষয় উপস্থাপনা করে অন্য একটি মিথ্যে দিয়ে প্রসঙ্গকে নিজের কব্জায় আনবার এক বিশেষ কৃতিত্বপূর্ণ যোগ্যতা তার আছে, অন্তত এ-গল্পে তার্কিক ও বক্তাদের বিমূঢ় করবার কৌশলে পাঠকও মুগ্ধ হতে বাধ্য। বৈদান্তিক শাক্ত, বৈষ্ণব, সন্ন্যাসী থেকে পরিণামবাদ ছুঁয়ে একটি মেয়েকে কুমারী, সধবা, হিন্দুস্তানি, মুসলমান, কুলীন ব্রাহ্মণী, ভৈরবী বানিয়ে কাহিনী সমাপ্ত করলেন নিরুদ্দিষ্ট স্বামী-স্ত্রীর মিলনপর্ব সজ্জার মধ্যে, বর্ষার গল্প-না ভূত বা পেত্নীর বুঝে ওঠা দায়, তবে গল্প চরম উপভোগ্য, যতই বন্ধুর পথ পেরিয়ে মোহানায় উপনীত হোক্। 'ঘোষালের হেঁয়ালি' গল্পের গোত্র-নির্ণয় এক অসম্ভব ব্যাপার। এখানেও ঘোষালের কথার মারপ্যাঁচে সত্যকে মিথ্যের আকার আর মিথ্যেকে সত্যের স্বরূপে প্রত্যক্ষ হয়। অসাধারণ বাক্য-নৈপুণ্য যে ঘোষালের করায়ত্ত গল্প-পাঠে তা বিন্দুমাত্র সংশয় থাকে না। এখানে 'সখীরাণীর দৌত্য' অংশে মীনারাণী তথা মীনাক্ষী দেবী অংশ খুবই কৌতূহলোদ্দীপক। প্রফেসরকে কাৎ করবার জন্য ঘোষাল তার শিক্ষার ফর্দ দিয়ে জানায় এম.এ. পাশ করেছে প্রথম মিক্সড ম্যাথমেটিক্স, পরে পিওর ফিলজফিতে, বছর প্রসঙ্গে জানায় ক্যালেন্ডারে পাওয়া যাবে না ঘোষাল তার ছদ্মনাম। মীনা রাণীর মত হলো ঘোষালের কথা সত্যও হতে পারে রসিকতাও হতে পারে। প্রসঙ্গত, প্রমথ চৌধুরীর 'বীরবল' ছদ্মনাম নেওয়া পেছনে যুক্তিটি এরকম : 'আমি যখন দেশের লোককে রসিকতাচ্ছলে কতকগুলি সত্য কথা শোনাতে মনস্থ করি, তখন আমি না

ভেবেচিন্তে বীরবলের নাম অবলম্বন করলুম' এবং জানালেন, 'আমি বাঙালি জাতির বিদূষক মাত্র। তবে রসিকতাচ্ছলে সত্য কথা বলতে গিয়ে ভুল করেছি। কারণ নিত্য আমি দেখতে পাই যে, অনেকে আবার সত্য কথাকে রসিকতা বলে, আর আমার রসিকতাকে সত্য কথা বলে ভুল করেন। এখন এ ভুল শোধরাবার আর উপায় নেই। পাঠকেরা যে আবার লেখার ভিতর সত্য না পান, রস পেয়েছেন, এতেই আমি কৃতার্থ। ঘোষালের উপ্যাখ্যান 'বীণাবাঈ'। খুব মজাদার গল্প। এখানে লেখকের সত্য ও রসিকতার মর্মদ্ধার প্রসঙ্গটি উল্লেখ্য। ঘোষাল জানান যখন তিনি প্রব্রজ্যা গ্রহণ করেন তখন কাশীতে এক পূজারী ব্রাহ্মণের কাছে সঙ্গীত শিক্ষা করেন। তারপরেই বলে ফ্যালেন এ বিদ্যা শিক্ষা করেন স্বয়ং সরস্বতীর কাছে, কথাটি বেপরোয়া বলায় ঘোষাল জানান সত্য কারো পরোয়া করে না, আসলে শিক্ষাগুরু হচ্ছেন একটি অলোকসামান্যা রমণী, তার নাম হচ্ছে বীণাবাঈ। তিনি নাকি এদেশ-ওদেশ ঘুরে বুন্দেলখণ্ডের সুরপুরে যান, মিশ্রজী ওখানকার সর্বপ্রধান গাইয়ে, তাঁরই নির্দেশে তাঁর পালিতা কন্যা বীণাবাঈয়ের কাছে সঙ্গীত শিক্ষা করেন ঘোষাল। পরীক্ষা করার জন্য গান গাইতে বলতে তিনি একটি তম্বুরা নিয়ে 'নৈয়া ঝাঁঝরি' বলে একটি আশাবরী গান, তিনি তুষ্টা হন। তাকে বাই বলতে বারণ করে বীণা বেন বলতে অনুরোধ করেন। গুরুজীর দেহত্যাগের পর বীণা সব সম্পত্তি পেলেও গুরুজীর ভাই হরিকুমার মিশ্রকে প্রত্যর্পণ করলেন। স্থির হলো কারো বাড়ি গাইতে যাবেন না, তাঁর কাছে গান শুনতে আসতে হবে — এরকম এক সময়ে বড়োবাবুর অসুস্থতা ঘটল সে বাড়িতেই। শ্রোতার দল বিদায় হলো, ঘোষালের কাছে বীণার জীবনকাহিনী বিবৃত হলো, ঘটনা সত্য না মিথ্যে জিজ্ঞেস করলে জানান হলো সত্য-মিথ্যা দুই-ই তা সায়েন্স নয়, আর্ট।

'চার-ইয়ারী-কথা'ই প্রমথ চৌধুরীর গল্পসমূহের মধ্যে সবচেয়ে বেশী আলোচিত ও আলোড়িত। যদিচ ঘটনার সমস্তটাই কালাপানির ওপারে, তবু প্রেমের সপ্তাশ্ববাহী বর্ণচ্ছটায় উজ্জ্বল এ-গল্পমালায় লেখকের অন্তর্ভূমিকে প্রত্যক্ষ করা যায়। নারী-সৌন্দর্যের অপরূপ রূপনির্মিতি যে লেখকের মনোজগতে চিরভাস্বর গল্পচতুষ্টয়ের মধ্য থেকে তা স্পষ্ট হয়ে ওঠে। অথচ কোনো কাহিনীই খুব সহজাত নারীর কথায় ব্যক্ত নয়, যা আপাত অ-স্বভাবী। তাই সবচেয়ে অভিনবত্বে মণ্ডিত। তাতে কোনো সন্দেহ থাকে না। চার ইয়ারের গল্পে সেনের কথায় আছে পাগলা গারদ থেকে উধাও হওয়া সুন্দরী, সীতেশের আখ্যানে প্রতারক ও চোর রমণী। সোমনাথের বিবৃতিতে সীতেশের মতোই প্রতারিত, তবে প্রেমে — এমন কন্যা আর রায়ের জবানীতে দাসী আনির পরলোক থেকে প্রেম-অনুরাগের স্বীকারোক্তি — চতুরঙ্গের চার অঙ্গে একমাত্র রায়ের ক্ষেত্রে আনি এক তরফা প্রণয় নিবেদন ছাড়া দুয়ের সম্মিলিত প্রেমের নিগড়ের ছবি নেই। অথচ চারটি পিপাসাকাতর যুবার প্রেম স্বপ্নের উদাহরণ আকাঙ্ক্ষার স্বরূপ ধরিয়ে দেয়

সহজেই। প্রমথ চৌধুরীর 'গল্পসংগ্রহে'র প্রথমেই আছে 'প্রবাসী স্মৃতি', যেখানে বসন্তের নকীবের কাজ কুলুধ্বনি যেন শ্রুত হয়। আবার 'চার ইয়ারী কথা'র আগে মুখবন্ধও লেখক সৃজন করেছেন হয়তো উপক্রমনিকাস্বরূপ। এবার চরিত্র-চতুষ্টয়ের অন্তর্জগতে স্বরূপ-সন্ধানে বেরোনো যেতে পারে। সেনকে দিয়েই সূচনা করা যাক্ : 'আমার দেহ ছিল এ দেশে, আর মন ছিল ইউরোপে। সে মনের উপর ইউরোপের আলো পড়েছিল, এবং সে আলোয় স্পষ্ট দেখতে পেতুম যে, এ দেশে প্রাণ নেই; আমাদের কাজ, আমাদের কথা, আমাদের চিন্তা, আমাদের ইচ্ছা — সবই তেজোহীন, শক্তিহীন, ক্ষীণ, রুগ্ন, ম্রিয়মান এবং মৃতকল্প।' সীতেশের অনুভব : 'রাস্তায় যদি কোনও মেয়ে একা চলে, আর তার যদি রূপযৌবন থাকে, তাহলে হাজার পুরুষের মধ্যে পাঁচশ'জন তার দিকে ফিরে ফিরে তাকাবে। পঞ্চাশজন তার দিকে তাকিয়ে মিষ্টি হাসি হাসবে, পাঁচজন গায়ে পড়ে আলাপ করবার চেষ্টা করবে, আমি তোমাকে ভালবাসি।' সোমনাথের ভাষ্য : 'একটি ফরাসী কবি বলেছেন যে, রমণী হচ্ছে আমাদের দেহের ছায়া, তাকে ধরতে যাও সে পালিয়ে যাবে, তার কাছ থেকে পালাতে চেষ্টা কর, সে তোমার পিছু পিছু ছুটে আসবে। আমি বারমাস ধরে এই ছায়ার সঙ্গে অহর্নিশি লুকোচুরি খেলেছিলুম।' রায়ের ভালোবাসা-বিষয়ক উক্তি : 'মানুষের মনে অনেক রকম ভালবাসা আছে, যা পরস্পর বিরোধ না করে একসঙ্গে থাকতে পারে। এই দেখ না কেন, লোকে বলে যে শত্রুকে ভালবাসা শুধু অসম্ভব নয়, অনুচিত; — কিন্তু আমি সম্প্রতি আবিষ্কার করেছি যে শত্রু-মিত্র-নির্বিচারে, যে যন্ত্রণা ভোগ করছে, তার প্রতিই লোকের সমান মমতা, সমান ভালবাসা হতে পারি।' গল্পগুলির ভেতর থেকে চারটি চরিত্রের নিজস্ব মনোভঙ্গির সমীপবর্তী হওয়া যেতে পারে, তার পূর্বে একটু দৃষ্টি দেওয়া যেতে পারে পটভূমি রচনার ক্ষেত্রটির দিকে, লেখক জানেন মনের অন্তর্কোণের সংবাদ প্রকাশের একটি সুষ্ঠু বাতাবরণ পাঠকের সামনে হাজির হওয়া দরকার, তাই প্রেমের অসঙ্গতির বিবরণ জানানোর প্রসঙ্গে এনেছেন এক দুর্যোগময় রাত্রি, ব্যাকুল হয়ে আকাশের দিকে চাইতে মনে হল যেন কে সমস্ত আকাশটিকে একখানি একরঙা মেঘের ঘেরাটোপ পরিয়ে দিয়েছে এবং সে রঙ কালোও নয়, ঘনও নয়, কেননা তার ভেতর থেকে আলো দেখা যাচ্ছে, ছাই-রঙা কাঁচের ঢাকনির ভেতর দিয়ে এমন আলো এর আগে চোখে পড়েনি, পৃথিবীর ওপরে সে রাত্তিরে যেন শনির দৃষ্টি পড়েছিল— এমন রাতেই তো মনের অর্গল খুলে হৃদয়-সঞ্চিত অনুভবকে প্রকাশ করবার প্রকৃত সময়, গল্পগুলির ভাবগত ঐক্যও অনুপস্থিত নয়। চারটি গল্পেই প্রেমের অসঙ্গতিকে রূপ দেওয়া হয়েছে। প্রেমানুভূতির সহজ সাবলীল প্রবাহটি এখানে আকস্মিকতার মরুবালির মধ্যে পথ হারিয়েছে। সেনের গল্পে ছায়ারূপিনী প্রেম, বাস্তবতাবিবর্জিত সুদূরবিসর্পিত তার মুখের কথাই তা ব্যক্ত করে, 'আমার মনের প্রকৃতি এতটা অস্বাভাবিক হ'য়ে গিয়েছিল যে মনে কোনও অবলা সরলা ননীবালার প্রবেশাধিকার ছিল না' — সেনের মনোযোগের

চিত্র এখানে স্পষ্ট। যে eternal faminine-কে হারিয়েছে, তাতে নিজেকে পেয়েছে ফিরে। সীতেশ এর বিপরীতপ্রান্তে দাঁড়িয়ে, অভীপ্সায় সে আতুর। সোমনাথের রিণী অন্য এক ভূমিতে দাঁড়িয়েছে, 'একটি বর্ণচোরা দৈহিক প্রবৃত্তিই যে পুরুষের নারীপূজার মূল' — সোমনাথের হৃদগত্। রায়ের উক্তি প্রাণিধানযোগ্য, 'সেন কবিতায় যা গড়েছেন, জীবনে তাই পেতে চেয়েছিলেন। সীতেশ জীবনে যা পেয়েছিলেন, তাই নিয়ে কবিত্ব করতে চেয়েছিলেন। ফলে তিনজনই সমান আহম্মক বনে গেছেন।' রায় এই বিশ্লেষণের মাধ্যম অপরের মনোজগত বিশ্লিষ্ট করে দেখেছে, এখন বাকি তার জীবনালেখ্য, বস্তুজীবনে যা মেলেনি তা-ই এক অলৌকিকতার স্পর্শে তার কর্ণকুহরে প্রবেশ করেছে, ইহজীবনের বাইরে থেকে আসার আশ্রয়টুকু লেখক গ্রহণ করেছেন যা সাহিত্যে হতে পারে অর্থাৎ যা সম্ভাবিত ছিল, কিন্তু আনুকূল্য পায় নি। রায়ের পূর্বে ত্রয়ী সুস্থতার পথে প্রেমকে স্পর্শ করতে অক্ষম হয়েছিল, প্রেম নানা রূপরসতরঙ্গিত হয়ে মনোভূমিকে স্নিগ্ধ সৌরভে ভরে তোলে তার সাক্ষাৎ পাগলা গারদ থেকে আবির্ভূত নারীর কাছ থেকে আসেনি, সীতেশ কাছে চৌর্যবৃত্তির রমণীর নিকটে লভ্য হয়নি, সোমনাথের ক্ষেত্রে তদ্রুপ, রায়ের জন্য প্রেমের নীরব-নম্র প্রেম তার ঔদাসীন্যে চক্ষুষ্মান হয়নি, তাকে পরলোক থেকে ইহলোকে নারীর অন্তর্জাত প্রেমের বার্তা শুনতে হলো, বিস্ময়ের কথা সেটাই প্রেমউন্ময়। সৌন্দর্যপিপাসু লেখক কল্পলোকেই রঙ-রূপে ভরা প্রেমকে প্রত্যক্ষ করতে বাধ্য হলেন, মূলকথা হয়তো তাই।

প্রমথ চৌধুরীর গল্পের সংখ্যা কম নয়, তার বৈচিত্র্যও লক্ষণীয়, তার বিচিত্র যাত্রা পাঠকের দৃষ্টি এড়িয়ে যায় না। রবীন্দ্রনাথের উপলব্ধির দিকে একবার চোখ বোলানো যাক। 'তোমার ছোটগল্পে প'ড়ে চেকভের ছোটগল্প মনে পড়ল। মুখে যা এসেছে, তা ব'লে গেছ হালকা চালে। এরকম কিছুই না লিখতে সাহসের দরকার করে। দেশের লোক সাহিত্যে ভূরি ভোজন ভালবাসে — তারা ভাববে ফাঁকি দিয়েছে — কিম্বা ভাববে ঠাট্টা।' এই কথার সূত্র ধরে কিন্তু গল্পের প্রসঙ্গে আসা যায়, 'যেমন আহুতি' — এতে গল্পের নায়কের নামোল্লেখ নেই, ট্রেন যাত্রার পর পাল্কিতে তার দীর্ঘ যাত্রা এবং রুদ্রপুরের ইতিহাস বর্ণন শক্তিশালী লেখনি ভিন্ন এতো চমৎকার উৎরাতে অক্ষম, কিংবা 'বড়াবাবুর একদিন' — অভিনয় দর্শন নিয়ে কাহিনী পরিণতি বস্তুতই খুব অভিনব বিষয় — এই বৈচিত্র্য শ্লাঘনীয়। 'একটি সাদা গল্প' 'চার-ইয়ারী কথা'র প্রসঙ্গ মনে করিয়ে দেয় যেমন সনাতনের কথা বা প্রফেসরের কথা। 'ছোটগল্প' গল্পে বাক্‌যুদ্ধ মূলে নিহিত, এখানে ছোটোগল্পের ফর্ম-এর ধারণা স্পষ্ট। 'গল্প লেখা'য় সমালোচকদের জানাতে চেয়েছেন, 'গল্প লেখার অধিকার আছে কি না জানিনে, কিন্তু না লেখার অধিকার আমার নেই।' এখানে লেখক তাঁর গল্প সম্বন্ধে একটি অভিযোগের উত্তর দিয়েছেন, এ-গল্পে স্বামী স্ত্রীর কথোপকথনের সূত্রে তা চোখে পড়ে। '— আমাদের এই কথোপকথন লিখে পাঠিয়ে দেও, সেইটেই হবে — .....

গল্প না প্রবন্ধ? ..... একাধারে ও দুই-ই।' তিনি সচেতন ছিলেন প্রবন্ধ ও গল্পকারের মধ্যে দ্বন্দ্ব বেধে গেছে কোথাও।

বাংলা ছোটগল্পের ধারায় প্রমথ চৌধুরীর স্থান নির্ণয়ে তার অবদান প্রসঙ্গে এক অভিনব নির্মাণশিল্পী হিসেবে তাঁর গ্রহণযোগ্যতা স্বীকৃত। কিন্তু তিনি এই নবীনতর বঙ্গ সাহিত্যের শিল্প-উদ্যোগে চিরন্তনতার দাবিদার হতে পারেন নি, একটি নির্দিষ্ট গণ্ডি হয়তো ইচ্ছাকৃতভাবেই লঙ্ঘন করবার অভীপ্সা তাঁর ছিল না। ছোটোগল্পের কায়া-পরিধি, বিষয়বস্তু বৈচিত্র্য সম্পাদনে তাঁকে খুব উৎসাহিত হতে দেখা যায়নি, হয়তো এ-কথা স্মরণে রেখেই আলোচক শিশিরকুমার দাশের মনে হয়েছে, '..... 'গল্পগুচ্ছ' বস্তুপুঞ্জের প্রতি রবীন্দ্রনাথের যে দৃষ্টি তা প্রমথ চৌধুরীর মধ্যে পাওয়া যায় না। অর্থাৎ রবীন্দ্রনাথ যে 'গল্পগুচ্ছে' জীবনের সামাজিক রূপের প্রতি দৃষ্টি দিয়েছেন, প্রমথ চৌধুরীর দৃষ্টি শুধু চারুকলায়, কারুকলায়। এজন্যই শরৎচন্দ্র বা প্রভাতকুমার বা রবীন্দ্রনাথের মত সার্বজনীন আবেদন তাঁর নেই। তাঁর গল্প সৌন্দর্য সৃষ্টিতে মগ্ন, নাগরিক চাতুর্য সৃষ্টিতে রত, আর সেই সঙ্গে বুদ্ধিদীপ্ত কয়েকটি লোকের আসরে বসে গল্প করা ও তর্ক করার যে প্রবৃত্তি সেটিও তাঁর গল্পের লক্ষণ। তাঁর 'ছোটগল্প' গল্পটি প্রকৃতপক্ষে তর্ক প্রবন্ধ হতে হতে গল্প হয়ে গেছে' ('বাংলা ছোটগল্প, জুলাই ১৯৮৬ সংস্করণ, পৃ ১৭৫) সব গল্প না হলেও অধিকাংশ গল্প প্রসঙ্গে উক্তিটি যে প্রযোজ্য — এ ব্যাপারে নিঃসন্দেহ হওয়া যায়।